দাঁতের চিকিৎসায় পারদ ব্যবহারে যে ক্ষতি

দাঁতের চিকিৎসায় স্থায়ী ফিলিং দেওয়ার সময় অর্থাৎ সিলভার এমালগাম ফিলিং দেওয়ার সময় মারকারী বা পারদ ব্যবহার করা হয়। ডেন্টাল এমালগাম ফিলিংয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ মারকারী বা পারদ বিদ্যমান থাকে। এই পারদ থেকে মুখে আলসার হতে পারে। আরও বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন মুখ ও দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মো. ফারুক হোসেন।

পারদ সহজেই বাষ্পীভূত হয় এবং চর্ম ও শ্বাসনালি দ্বারা শোষিত হয়। পারদ প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষিত করে। ডেন্টাল এমালগাম ফিলিং দেওয়ার সময় কোনোভাবে পারদ মুখের মিউকাস মেমব্রেনের সংস্পর্শে এলে এবং মোটামুটি একটি নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করলে মুখে আলসার বা অন্য যে কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

পারদের বাষ্প কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকারক যা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। মারকারী বা পারদের প্রভাবে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ডিজেনারেশন হয়ে থাকে। সিলভার এমালগাম ফিলিং আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

এটি বিজ্ঞানসম্মত সত্য যে, বিষাক্ত পারদের বাষ্প সিলভার এমালগাম ফিলিং থেকে নিঃসৃত হয়। এমালগাম ফিলিং যে দাঁতে থাকে তার পাশে মিউকোসায় রেটিকুলেট, লেসি, প্ল্যাকের মতো বা ইরোসিভ লাইকেনয়েড রিঅ্যাকশন দেখতে পাওয়া যায়। তবে সবসময় বা সবার ক্ষেত্রে এ ধরনের লক্ষণ দেখা যায় না।

দাঁতে সিলভার এমালগাম ফিলিং দেওয়ার সময় অসাবধানতাবশত ফিলিংয়ের উপাদান মুখে থেকে গেলে তা মুখের মিউকোসাতে পিগমেন্টেড প্লাগ তৈরি করতে পারে যা এমালগাম টাট্টু নামে পরিচিত। অনেক সময় মুখের মিউকোসাতে মারকারী বা পারদ শোষিত হলে মুখের মিউকোসাতে আলসার দেখা যায়, যা ভালো হতে সময় লাগে।

পাইলস কখন হয়, প্রতিরোধের উপায়

পাইলসের কোনো সঠিক সংজ্ঞা এখনো পর্যন্ত চিকিৎসকদের জানা নেই। কারণ এ রোগটির আসল প্রকৃতি এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি বোধগম্য নয়। পাইলস বলতে আমরা বুঝি মলদ্বারের ভেতরে ফুলে ওঠা রক্তের শিরার একটি মাংসপিণ্ড। এরূপ রক্তের শিরার মাংসপিণ্ড বা ‘কুশন’ সব মানুষেরই রয়েছে। তাই প্রকৃত অর্থে পাইলস বা ‘হেমোরয়েড’ আমরা তখনই বলি যখন এটি কোনোরূপ উপসর্গ সৃষ্টি করছে। যেমন মলদ্বারের বাইরে ঝুলে পড়া মাংসপিণ্ড অথবা রক্ত যাওয়া। প্রতিটি মানুষের তিনটি পাইলস বা ‘কুশন’ আছে। বড় পাইলসের মাঝখানে ছোট ছোট পাইলসও থাকতে পারে। মলত্যাগ করার সময় শিরাগুলো কিছুটা ঝুলে পড়ে এবং রক্ত ভর্তি হয়ে ফুলে ওঠে তারপর ফেটে গিয়ে রক্ত বের হয়।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন ইডেন মাল্টি-কেয়ার হাসপাতালের (প্রা.) ল্যাপারোস্কপিক অ্যান্ড লেজার সার্জন ডা. আসিফ আলমাস হক।

পাইলস কখন হয়: ৩০ থেকে ৬০ বৎসর বয়সের ভেতর এ রোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। ২০ বছর বয়সের নিচে পাইলস খুব একটা দেখা যায় না। এ রোগ মহিলাদের চেয়ে পুরুষের কিছুটা বেশি হয়।

কারণ: কয়েক শতাব্দীর গবেষণা সত্ত্বেও পাইলসের প্রকৃত কারণ উদঘাটিত হয়নি। তবে কিছু কিছু রোগ পাইলস হওয়াকে ত্বরান্বিত করে, যেমন- মলত্যাগে অতিরিক্ত কোঁত দেওয়া, অনিয়মিত মলত্যাগের অভ্যাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া ইত্যাদি। অন্য কিছু কিছু কারণ আছে যার জন্য পাইলস হতে পারে, যেমন- বংশগত, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা, অনেকক্ষণ গরমে থাকা, ভারী ওজন তোলা, গর্ভাবস্থা, আঁটসাঁট পোশাক পরা, হরমোনের প্রভাব, আঁশজাতীয় খাবারের অভাব ইত্যাদি।

উপসর্গ : বহিঃস্থিত পাইলসের ক্ষেত্রে মলদ্বারের বাইরে ফোলা থাকে এবং কিছুটা ব্যথা বা অস্বস্তি হতে পারে। অভ্যন্তরীণ পাইলসের ক্ষেত্রে টয়লেটে টাটকা লাল রক্ত দেখা যায়। কোনোরূপ ব্যথা থাকে না। মলত্যাগের শেষে রক্ত যায়। রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় যায় আবার কখনো তীরের বেগে যায়। রক্ত যাওয়ার পর যদি বেশি ব্যথা ও জ্বালাপোড়া হয় তাহলে এনাল ফিশার বা ক্যানসার হতে পারে। রক্ত

যেতে যেতে রোগী গভীর রক্তশূন্যতায় ভুগতে পারেন। মলদ্বারের বাইরে পাইলসটি ঝুলে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে মলত্যাগ শেষে পাইলসটি আপনা আপনি ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। পাইলসে সাধারণত ব্যথা হয় না। থ্রম্বোসিস হলে বা পাইলস বাইরে অতিরিক্ত ঝুলে থাকলে ব্যথা হতে পারে। মলদ্বারে শুধু পাইলস রোগই হয় না আরও অনেক রোগ হয় যার শতকরা বিশ ভাগ রোগী পাইলসে আক্রান্ত।

প্রতিরোধের উপায়: এ রোগ প্রতিরোধের উপায় হচ্ছে সময়মতো কোষ্ঠকাঠিন্য ও ডায়রিয়ার চিকিৎসা করা, টয়লেটে বসে বসে পেপার/বই না পড়া, খাবারের সঙ্গে আঁশ জাতীয় জিনিস যেমন-ফল, সবজি, সালাদ পরিমাণ মতো খাওয়া, দৈনিক ৬-৮ গ্লাস পানি পান করা, ভারী ওজন না তোলা, অতিরিক্ত গরমে বেশিক্ষণ না থাকা ইত্যাদি।

প্রথম সন্তানের হৃদরোগ হলে কি দ্বিতীয়টিরও হয়?

জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত শিশু ছোটবেলা থেকেই নানান স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকে। তাদের বিশেষ যত্ন নিতে হয়। অনেকেরই জানা নেই জন্মগত হৃদরোগ হলেও অনেক শিশু জন্মের সময় স্বাভাবিক থাকে। জন্মের ৩ মাস পর শিশুর গুরুতর হৃদরোগ ধরা পড়তে পারে।

প্রথম সন্তানের জন্মগত হৃদরোগ হলে দ্বিতীয় সন্তানের জন্য কখন পরিকল্পনা করা উচিত, আর দ্বিতীয় শিশুরও জন্মগত হৃদরোগ হওয়ার আশঙ্কা কতটুকু এ নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সভাপতি বাংলাদেশ শিশু চিকিৎসক সমিতি এবং সভাপতি পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সোসাইটি অব বাংলাদেশ অধ্যাপক ডা. মনজুর হোসেন।

স্বাভাবিক পদ্ধতিগত শরীরের রক্তচাপ প্রায় ১০০-১২০ mmHg (সিস্টোলিক) এবং ৬০-৮৯ mmHg (ডায়াস্টোলিক)। ফুসফুসের রক্তচাপ সিস্টেমিক চাপের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ। হৃৎপিণ্ডের ডান দিকে গড় SpO2 হলো ৬০-৬৫% এবং বাম দিকে SpO2 হল >৯৫%। সাধারণত, বাম হৃৎপিণ্ডে রক্ত প্রবেশের একটি মাত্র পথ থাকে, তা হলো পালমোনারি সঞ্চালনের মাধ্যমে।

মায়ের গর্ভাবস্থায় বাচ্চার ফুসফুস অ্যামনিওটিক তরলের মধ্যে একটি ভাসমান বেলুনের মতো থাকে, তাই বিকল্প চ্যানেলগুলো, অর্থাৎ পেটেন্ট ফোরামেন ওভেল এবং পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস পাওয়া যায়। এ চ্যানেলগুলো জন্মের পরে এক পর্যায়ে বন্ধ হয়ে যায়। যদি বন্ধ না হয়, তাহলে জটিলতা তৈরি হতে পারে। অন্যদিকে কিছু জটিল হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে এগুলো খোলা থাকা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে খোলা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা দেওয়া হয়।

জন্মগত হৃদরোগের লক্ষণ

বিভিন্ন উপসর্গ দেখে শিশুর মধ্যে হৃদরোগ শনাক্ত করা যায়। তবে, বয়স অনুসার লক্ষণগুলো পরিবর্তিত হয়। কিছু কিছু উপসর্গ থাকলে শিশুর হৃদরোগ আছে তা দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়। জন্মগত হলেও জন্মের পর বা কিছু সময়ের জন্য জন্মগত হৃদরোগের কোনো লক্ষণ নাও থাকতে পারে। কখনও কখনও সাধারণ জন্মগত হৃদরোগ, যেমন ‘হোল-ইন-হার্ট’ জন্মের পর প্রথম কয়েক সপ্তাহে শনাক্ত করা যায় না। সবচেয়ে সাধারণ হৃদরোগ যেমন ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট এবং পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস প্রথম ১-৪ সপ্তাহে লক্ষণহীন থাকতে পারে। এটি ফুসফুসের চাপ এবং রক্তপ্রবাহ পরিপক্কতায় বিলম্বের কারণে ঘটে থাকে। ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ত্রুটি এবং পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস (ভিএসডি এবং পিডিএ) ধীরে ধীরে ফুসফুসের চাপ ও রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করে এবং হার্টের আকারও বাড়ায়।

হৃৎপিণ্ডে একটি বড় ছিদ্র হলে ফুসফুস এবং শরীরের মধ্যে রক্ত প্রবাহের ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে। হৃৎপিণ্ডে একটি বড় ছিদ্র বর্ধিত শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রচেষ্টার জন্য হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শরীরের বৃদ্ধি ধীর হয়, দুর্বল বা ওজন বৃদ্ধি পায় না। জন্মের ৪-৬ সপ্তাহ পরে লক্ষণগুলো শুরু হয়।

অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট হলো আরেক ধরনের ছিদ্র, যা অনেক বছর ধরে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সুপ্ত থাকতে পারে। স্টেনোসিস বা ভালভের সংকীর্ণতা যে কোনো বয়সে এমনকি প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষা করানো উচিত।

যারা হৃদরোগের জন্য কিছু সূত্র খুঁজে বের করতে ক্লিনিকাল পরীক্ষা ছাড়াও বিশেষ কিছু পরীক্ষা যেমন বুকের এক্স-রে, ইকো এবং

[illegible] CHD-[illegible]

* [illegible] : [illegible], [illegible] (>[illegible] [illegible]), [illegible]-[illegible]

* [illegible] : [illegible]

* [illegible] : [illegible]

* [illegible], [illegible]-[illegible] ([illegible]) [illegible]

* [illegible] ([illegible])[illegible]-[illegible]

lPrecordial bulge : [illegible]

* [illegible] (Cyanotic Heart Disease) : [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible] CHD-[illegible], [illegible] CHD-[illegible] CHD

নিয়মিত ফলো-আপের প্রয়োজন হয় এবং প্রথম দিকে প্রতি কয়েক সপ্তাহ পর পর প্রয়োজনীয় ফলো-আপ প্রয়োজন হতে পারে।

জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত শিশু স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে, তবে কিছু কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তাই মাতা-পিতাই সঠিক ভাবে যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারেন। যদি সময় মতো CHD নির্ণয় করা হয় এবং চিকিৎসকের দেওয়া পরামর্শ কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় তবে বেশিরভাগ CHD নিরাময়যোগ্য। অনেক শিশুর ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি এবং কিছু ক্ষেত্রে দেরিতে চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। তবে, CHD-এর বেশিরভাগই সাধারণ ত্রুটি এবং অনেক ক্ষেত্রে শুধু ওষুধেই নিরাময়যোগ্য।

যেসব শিশু সময়মতো চিকিৎসা পায়, তারা তাদের পূর্ণ সক্ষমতা অনুযায়ী জীবন ধারন করতে পারে। অন্যদিকে, CHD আক্রান্ত প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিশু পূর্ণ ক্ষমতা অর্জন করতে পারে না এবং তাদের একটি সীমাবদ্ধ ও পরিমিত জীবনধারা পালনের পরামর্শ দেওয়া হয়। চিকিৎসাক্ষেত্রেও তাদের একাধিক পদ্ধতির প্রয়োজন হতে পারে। নীল শিশুরা ডিহাইড্রেশন এবং রক্তস্বল্পতা সহ্য করতে পারে না, তাই এই নীল শিশুরা কান্না করলে তাদের সমস্যা গুরুতর হয়ে যায়, যাকে স্পেল বলা হয়। যখন তারা দ্রুত শ্বাস নেয় ও আরও নীল হয়ে যায় এবং নিস্তেজ হয়ে পড়ে তখন দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। এই শিশুদের ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

CHD আক্রান্ত হলে সময়মতো চিকিৎসা সর্বোত্তম ফলাফল নিয়ে আসে। প্রথম সন্তান যদি CHD-তে আক্রান্ত হলে সেই মা যদি দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হন তাহলে অনাগত শিশুদের মধ্যে ২-৫% এর CHD-তে আক্রান্ত ঝুঁকি থাকে। এক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় প্রসূতি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতো চলা উচিৎ। ১৬ থেকে ১৯ সপ্তাহের মধ্যে ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে গর্ভের শিশুর CHD ধরা পড়লে গর্ভপাতের পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে জেনেটিক কাউন্সেলিংয়েরও সুপারিশ করা হয়।

চিকিৎসকদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বাধীনতা নেই

চিকিৎসকদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বাধীনতা নেই বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ) কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন।

তিনি বলেন, চিকিৎসকরা চিকিৎসা সেবায় নিবেদিত। চিকিৎসকদের উপর কোন অন্যায় আচরণ সহ্য করা হবে না। চিকিৎসকদের কাজে কোন অবহেলা থাকলে আইনের আশ্রয় নিবেন। শক্তি প্রয়োগ করে চিকিৎসক ও প্রতিষ্ঠানের উপর হামলা করা যাবে না।

বুধবার বিকেলে কুষ্টিয়া ম্যাটসের গ্যালারী সম্মেলন কক্ষে কুষ্টিয়া জেলায় ৩৯ তম বিসিএস (২য় ফেজ) ও ৪২ তম বিসিএস-এ যোগদানকৃত চিকিৎসকদের সংবর্ধনা প্রদানকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, জরুরী বিভাগেও চিকিৎসা দিতে গিয়ে অনেক সময় রোগীদের স্বজনদের কাছে রোষানলের স্বীকার হতে হয়। অথচ ইউএনওর বাড়ী ও কার্যালয় ঘিরে ১১ জন সশস্ত্র আনসার থাকে।

অথচ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ঝুঁকি নিয়ে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। তাই চিকিৎসক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে আইন করতে হবে।যাতে করে চিকিৎসকরা নির্বিঘ্নে চিকিৎসা সেবা দিতে পারে।

বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ) কুষ্টিয়া জেলা শাখার ডাঃ এসএম মুসতানজীদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ডাঃ এএফএম আমিনুল হক রতনের পরিচালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ) কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব ডাঃ মোঃ ইহতেশামুল, সহসভাপতি ডাঃ শেখ বাহারুল আলম, কার্যকরী পরিষদের সদস্য ডাঃ জামাল উদ্দিন চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক ডাঃ মোহাঃ শেখ শহীদ উল্লাহ, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ মোঃ দেলদার হোসেন, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাঃ মোঃ আব্দুল মোমেন, কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডাঃ এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ কুষ্টিয়ার সাধারণ সম্পাদক ডাঃ জামাল উদ্দিন মোল্লা, ডাঃ লিজা-ডাঃ রতন ম্যাটসের চেয়ারম্যান ডাঃ আসমা জাহান লিজা, ডাঃ মনিরুজ্জামান টিপু, ঝিনাইদহ জেলা বিএমএর সভাপতি

ডাঃ রেজা সিকান্দার, বিএমএ কুষ্টিয়া ডা: মনিরুজ্জামান টিপু ও ডা: রাজীব মৈত্রী।

এসময় বক্তারা নব-যোগদানকৃত ডাক্তারদের অনুরোধ জানিয়ে বলেন, এলাকার রোগীদের যাতে সঠিকভাবে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা যায় তার জন্য নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব নিয়ে সেবা প্রদান করতে হবে।

ডাক্তারী পেশায় হচ্ছে একটি মানব সেবামূলক বিষয়। এই সেবার মাধ্যমে জনগণের খুব কাছাকাছি যাওয়া যায় এবং নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করা যায়।তাই নতুন ডাক্তারদের সঠিকভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানানো হয়।

সততা মানুষের সতিত্ব উল্লেখ করে নবীন চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তোমাদের চাকুরী জীবন সবে শুরু হলো। তোমরা যে মহান চিকিৎসা পেশার সাথে জড়িত। তাই সততার সাথে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার আহবান জানান তিনি।

পরে যোগদানকৃত চিকিৎসকদের মাঝে ফুল ও উপহার সামগ্রী তুলে দেয়া হয়। এছাড়াও বিএমএ সদস্যফরম তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। এরআগে অনুষ্ঠানের শুরুতেই অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানান কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সন্ধানী ইউনিটের শিক্ষার্থীরা।

মেহেরপুরে এক সপ্তাহে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত ৩১১ জন

আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে হঠাৎ করে বাড়তে শুরু করেছে ডায়রিয়া। এর প্রভাব পড়েছে মেহেরপুরেও। ডাইরিয়ায় আক্রান্ত প্রতিদিন অতিরিক্ত রোগী ভর্তি হচ্ছে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালসহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতেও। মেহেরপুরে ডায়রিয়া আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তবে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে অনেকে বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছেন এমন খবরও পাওয়া গেছে।
গতকাল রবিবার বিভিন্ন হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত এক সপ্তাহে জেলার বিভিন্ন স্থানে ৩১১ জন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ১২৩ জন, গাংনী উপজেলা হাসপাতালে ১৬৬ জন ও মুজিবনগরে ২২ জন ভর্তি হয়েছেন। মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ১০টি বেডের বিপরীতে প্রতিদিনই ২০ থেকে ২৫ জন রোগী ভর্তি হচ্ছেন। হাসপাতালগুলোতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীরা বেড না পেয়ে হাসপাতালের মেঝেতে শুয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
গাংনীর কাজীপুর গ্রামের ডায়রিয়া আক্রান্ত মুনছুর আলী জানান, গত পরশুদিন হাসপাতালে এসেছি। প্রায় সুস্থ্য হয়ে গেছি।
ও সাহারবাটি গ্রামের নুরজাহান জানান, হঠাৎ করে শরীর দুর্বল লাগছিলো। এরপর থেকে পেটে বাথার সাথে বমি ও পায়খানা শুরু হয়। পরিবারের লোকজন পরশুদিন সন্ধ্যায় গাংনী হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে ভালো লাগছে।
সদর উপজেলার ঝাঁঝাঁ গ্রামের মরিয়া নেছা বলেন, আমার শিশু জায়মা খাতুন হঠাৎ ডাইরিয়া আক্রান্ত হলে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। আমরা এখন সুস্থ হয়ে উঠেছি।
মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মকলেছুর রহমান জানান, শীত থেকে গরম পড়তে শুরু করায় ভাইরাল ডায়রিয়াটা বেশী হয়। এছাড়া কভিডের কারনে মানুষজন দীর্ঘদিন ঘরের বাইরে যেতে পারেনি। এখন লোকজন বাইরে যাচ্ছেন। বাইরের খাবার দাবার খাচ্ছেন। যে কারণে ডাইরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। তবে এই সময়ে প্রতিবছরই ডায়রিয়ার প্রকোপটা সাধারণত বৃদ্ধি পায়। তবে স্যালাইন থেকে শুরু করে অন্যান্য ওষধপত্র পর্যাপ্ত পরিমাণ রয়েছে।

শিশুদেরও কি ডায়াবেটিস হয়?

ডায়াবেটিস সর্বগ্রাসী রোগ। এ রোগ একবার কারো হলে শরীরে নানা জটিলতা বাড়তে থাকে। মধ্যবয়সে সাধারণত ডায়াবেটিস ধরা পড়ে। তবে বর্তমানে তরুণ বয়সেও অনেকে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়। শিশুদেরও ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি আছে কিনা এমন প্রশ্ন জনে জনে।

মূলত মানসিক দুশ্চিন্তা, ওজন বেড়ে যাওয়া, কায়িক শ্রমের ঘাটতি, বংশীয় কারণ, খাদ্যাভ্যাস ও জীবন পদ্ধতির পরিবর্তন এসব কারণে ডায়াবেটিস হয়ে থাকে। ডায়াবেটিস ধরা পড়ার আগেই সতর্ক থাকতে হয়।

শিশুদের ডায়াবেটিস রোগের ঝুঁকি নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সোসাইটি অব বাংলাদেশের অধ্যাপক ডা. মনজুর হোসেন।

শিশুদের মধ্যেও ডায়াবেটিসের প্রকোপ বাড়ছে। বেশিরভাগ শিশু শৈশবে টাইপ-১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়। তবে টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। আগে চিকিৎসকরা জানতেন যে বাচ্চারা কেবল টাইপ-১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয় এবং একে দীর্ঘকাল ধরে কিশোর ডায়াবেটিস (Juvenile Diabetes) নামে নামকরণ করা হতো। শিশুদের মধ্যে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের একক প্রধান কারণ হলো অতিরিক্ত ওজন। যখন কোনো শিশুর ওজন খুব বেশি বেড়ে যায়, তখন তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার আশংকা দ্বিগুণ হয়।

শিশুদের টাইপ-১ ডায়াবেটিস অবস্থায় শরীরে ইনসুলিন উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেয়। এক্ষেত্রে বেঁচে থাকার জন্য ইনসুলিনের দরকার পড়ে। ইনসুলিনের ঘাটতি বা অভাবকে ইনসুলিন ইঞ্জেকশন বা পাম্পের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। অগ্ন্যাশয় ইনসুলিন তৈরির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে কারণ ইনসুলিন উৎপাদনকারী কোষগুলো ধ্বংসের কারণে এমনটি হয়। কেন এমনটি ঘটে তা সঠিকভাবে কেউ জানেন না, তবে বিজ্ঞানীরা মনে করেন এটা জিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। টাইপ-১ ডায়াবেটিস সম্ভবত ভাইরাসের সংক্রমণের কারণেও হয়ে থাকে। অন্যদিকে, টাইপ-২ ডায়াবেটিসে, অগ্ন্যাশয়ের ইনসুলিন তৈরিতে কোনো ব্যাঘাত হয় না। তবে শরীর এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে সাড়া দেয় না বা প্রতিক্রিয়া দেখাতে ব্যর্থ হয়। ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স্ (Insulin Resistance)-এর কারণে এ সমস্যা দেখা দেয় যখন গ্লুকোজ কোষগুলোতে প্রবেশ করতে পারে না এবং শক্তি সরবরাহ করার সক্ষমতা কমে যায়। এ কারণে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়, ফলে পর্যায়ক্রমে অগ্ন্যাশয় আরও বেশি বেশি ইনসুলিন তৈরি করতে সচেষ্ট হয়। অবশেষে, এক সময় অগ্ন্যাশয় রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক রাখতে পর্যাপ্ত ইনসুলিন উৎপাদন করতে ধীরে ধীরে অক্ষম হয়ে পরে।

টাইপ-২ ডায়াবেটিসের জন্য বাচ্চাদের ঝুঁকির তিনটি কারণ-

* পরিবারের একজন সদস্যের টাইপ ২ ডায়াবেটিস থাকলে।

* মায়ের গর্ভকালীন ডায়াবেটিসসহ (গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস) জন্ম নেওয়া শিশুদের।

* যদি সন্তানের ওজন বেশি হয় এবং ওপরের দুটি ঝুঁকির কারণ থাকে।

ডায়াবেটিসের লক্ষণ: রক্তে উচ্চমাত্রার শর্করার জন্য ঘনঘন প্রস্রাব হয় এবং খুব তৃষ্ণার্ত থাকে বিধায় প্রচুর পানি পান করতে হয়। ক্লান্তি বা অবসাদ বোধ থাকে। কারণ শরীর শক্তির জন্য গ্লুকোজ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত শিশু এবং কিশোরদের ক্ষুধা বাড়তে পারে তবে ক্ষুধার্ত কোষগুলোকে জ্বালানি সরবরাহ করার প্রয়াসে শরীর পেশি ভেঙে ফ্যাট সংরক্ষণ করে যার জন্য ওজন হ্রাস পায়।

ডায়াবেটিসের চিকিৎসা: শিশুর টাইপ-১ বা টাইপ-২ ডায়াবেটিস আছে কিনা তা নির্ণয় করা আবশ্যক। কারণ ডায়াবেটিসের নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসা টাইপের ভিত্তিতে পৃথক হয়। মেটফরমিন নামে একটি ওষুধ গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। এটি এবং ইনসুলিন হলো ১৮ বছরের চেয়ে কম বয়সি শিশুদের জন্য রক্তে শর্করার হ্রাসকারী দুটি ওষুধ মাত্র।

চিকিৎসা অর্থাৎ লক্ষণগুলো হ্রাস করার জন্য ভালো ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধ এবং শিশু যাতে স্বাভাবিকভাবে তার শারীরিক, মানসিক, সংবেদনশীলতা বজায় রেখে সামাজিক বৃদ্ধি এবং বিকাশে সম্ভব হয়। আর এর জন্য, বাবা-মাকে লক্ষ রাখতে হবে শিশুর রক্তের শর্করার মাত্রা যতটা সম্ভব লক্ষ্য সীমার মধ্যে রাখা।

ডায়াবেটিসের কোনো নিরাময় নেই, ডায়াবেটিসের জন্য আজীবন চিকিৎসা প্রয়োজন। টাইপ-১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত শিশু-কিশোররা তাদের রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে প্রতিদিন ইনসুলিন ইনজেকশন বা ইনসুলিন পাম্পের ওপর নির্ভর করে। শিশুদের মধ্যে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে লক্ষণ ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে এবং প্রথম দিকে কোনো লক্ষণই থাকে না। কখনো নিয়মিত চেক-আপের সময় এই ব্যাধিটি শনাক্ত করা হয়।

ডায়াবেটিস থেকে জটিলতা

অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে ভবিষ্যতে হৃদরোগ, অন্ধত্ব দেখা দিতে পারে এবং কিডনি অকার্যকর হওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে মৃত্যুঝুঁকিও বেড়ে যায়। এছাড়া

ডায়াবেটিসে পরবর্তী জীবনে সরু রক্তনালি, উচ্চরক্তচাপ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। স্নায়ু বা নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রতিরোধ

তরুণদের মধ্যে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের সমস্যা বাড়ছে। বাবা-মায়ের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও জীবনধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে এ ভয়াবহ অবস্থার প্রতিরোধ সম্ভব। স্থূলতা বা যাদের ওজন বেশি-বিশেষ করে যদি তাদের পেটের চর্বি বেশি থাকে-তাদের ইনসুলিন অকার্যকর বা প্রতিরোধ (Insulin Resistance) হওয়ার আশংকা বেশি থাকে, তাই টাইপ-২ ডায়াবেটিসের জন্য ইনসুলিন প্রতিরোধ একটি প্রধান ঝুঁকির কারণ। ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের সাধারণত কোনো উপসর্গ থাকে না, যদিও কিছু বাচ্চার ত্বকে ঘন, গাঢ়, কাল মখমল প্যাঁচ তৈরি হয় যাকে অ্যাক্যানথোসিস নিগ্রিকানস (Acanthosis Nigracans) বলা হয়, সাধারণত ঘাড়ের পেছনে বা বগলের মতো শরীরের ক্রিজ এবং ভাঁজগুলোতে।

সুস্থ দাঁতের জন্য মেনে চলুন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

আমাদের দেশ বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দিন দিন উন্নত হচ্ছে। দন্ত চিকিৎসা ব্যবস্থায় অনেক আধুনিক হয়েছে। চিকিৎসা ব্যবস্থায় এসেছে অগ্রগতি। কিন্তু সারা বাংলাদেশের অধিকাংশ বিভাগের গ্রাম পর্যায়ের মানুষ এখনো জানেন না কিভাবে দাঁত মাজতে হয়? কী দিয়ে, কয়বার মাজতে হয়?

চিকিৎসা ব্যবস্থা যতই আধুনিক হোক না কেন, যে দেশের মানুষ ঠিক মতো দাঁত ব্রাশ করতে জানে না,তাদের মুখ ও দন্ত স্বাস্হ্য ব্যবস্থায় কোনো অবস্থাতেই উন্নতি সম্ভব নয়।

সিলেট বিভাগে শহর এবং গ্রামের স্কুলের বাচ্চাদের দাঁত ও মাড়ির অসামঞ্জস্যতা নিয়ে আমি গবেষণা করেছি। সেখানে অধিকাংশ বাচ্চাদের, শহর এবং গ্রামের উভয় স্থানেই এ সমস্যা প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।

শহরের বাচ্চাদের গ্রামের তুলনায় কিছুটা বেশি দাঁত উচু,নিচু,আঁকা বাঁকা।আর মেয়ে বাচ্চাদের দাঁতে বেশি সমস্যা।

সেখানে গবেষণা করতে গিয়ে তাদের কাছে আমি জিজ্ঞেস করে জানতে পারি ,তারা ঠিক মতো দাঁত ব্রাশ করতে জানে না, শক্ত খাবার চিবিয়ে খেতে চায় না,দাঁতে ক্ষয় হলে ডাক্তারের কাছে যায় না, বিশেষ করে মেয়ে বাচ্চাদের ধর্মীয় গোড়ামির কারণে ডাক্তার দেখাতে চায় না, বেশি বেশি ফাস্টফুড খায়। সবশেষে বিভিন্ন বিডিএস ডাক্তার নয় এমন লোকদের কাছে ভুল চিকিৎসা নিয়ে অপচিকিৎসার শিকার হচ্ছে।

ছোটবেলা থেকে যদি দুধ দাঁতের যত্ন না নেয়া হয়,ভবিষ্যতে দাঁত উঁচু নিচু আঁকা বাঁকা ছাড়াও মাড়ির নানা রকম সমস্যা নিয়ে, এই শিশুরা বড় হয়ে উঠবে।আমাদের এখনই উচিত শিশুদের দাঁতের যত্নে পথ শিশু থেকে শুরু করে, স্কুল, মাদ্রাসা, এতিমখানা সব জায়গায় সচেতনতার পাশাপাশি দাঁত ব্রাশের টুথ পেস্ট, টুথ ব্রাশ বিনামূল্যে, স্বল্পমূল্যে পৌঁছে দেয়া।

শিশুদের দাঁতের যত্ন মায়ের গর্ভ থেকে শুরু করতে হয়। গর্ভাবস্থায় মা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকলে বাচ্চার ঠোঁট ও তালু কাটা হওয়ার আশংকা তৈরি হয়। নোংরা পরিবেশের ফলে মায়ের শরীরে বিভিন্ন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ হয় যার ফলে বাচ্চার ঠোঁট ও তালু কাটা হয় বা হওয়ার আশংকা বেশি থাকে।

গর্ভবতী মায়ের বয়স বেশি হলে, ডায়াবেটিস, মাত্রাতিরিক্ত মেডিসিন নিলে বা হেভিডোজের ড্রাগ মাদকাসক্ত হলে, গর্ভাবস্থায় পুষ্টিকর খাবারের অভাব হলে শিশুর ঠোঁট ও তালু কাটা হতে পারে। কিছু ওষুধ আছে যা খেলে বাচ্চার দাঁত হলুদ হতে পারে। তাই মাকে এবং শিশুর অভিভাবককে অবশ্যই শিশুর দাঁতের যত্ন সম্পর্কে সচেতন এবং জ্ঞানী হতে হবে।

এখনই সময় এই শিশুদের এবং তাদের অভিভাবকদের দাঁতের যত্নে ভীষণভাবে সচেতন হওয়া। দাঁতের আঁকা বাঁকা,উঁচু নিচু চিকিৎসা সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয় বহুল।

সারা বাংলাদেশের মানুষকে এই ব্যপারে সচেতন করতে হবে। অন্যথায় চিকিৎসার অভাবে বড় হয়ে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হবে আজকের এই শিশুরা। আজকের শিশুরা আগামীদিনের ভবিষ্যত। শিশুদের এবং অভিভাবকদের মাঝে দন্ত স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি না করলে,এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভবিষ্যতে ভীষণ ভাবে ঝুঁকিতে পড়বে।

যেসব লক্ষণে বুঝবেন কোলোরেক্টাল ক্যান্সার

কোলোরেক্টাল ক্যান্সার একটি জটিল রোগে। খাদ্যাভ্যাস ও জীবনপদ্ধতির পরিবর্তনসহ নানা কারণে এই ক্যান্সার হয়।এপেনডিক্স, পায়ুপথ ও বৃহদান্ত্রের ক্যানসারকে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বলা হয়। কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের ঝুঁকি ও উপসর্গ নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ সার্জারি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. একেএম ফজলুল হক।

বয়স : কোলোরেক্টাল ক্যান্সার যে কোনো বয়সেই হতে পারে। তবে এ রোগে আক্রান্ত প্রতি ১০ জনের ৫০ বছর বা এর চেয়ে বেশি বয়সে এ রোগ হতে পারে। লিঙ্গ: পুরুষ ও মহিলা উভয়েই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারেন।

ধূমপান ও অ্যালকোহলের ব্যবহার : ধূমপায়ীরা অধূমপায়ীদের চেয়ে ৩০-৪০ ভাগ বেশি কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। অ্যালকোহল ব্যবহারকারীদের মধ্যেও এ রোগ হওয়ার ঝুঁকি বেশি।

অন্ত্রের অন্যান্য অসুখ: আগে থেকেই অন্ত্রের অন্য কোনো অংশে থাকা ক্যান্সার বা পলিপ অথবা অন্ত্রের অন্যান্য রোগ, যেমন মলাশয়ে আলসার তৈরি করে এমন প্রদাহ, অন্ত্রের প্রদাহ এ রকম কিছু কারণে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

বংশগত: বংশগত কারণেও কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। মা-বাবা, ভাইবোনের কারোর ৬০ বছর বয়সের নিচে অন্ত্রের পলিপ বা ক্যান্সার থাকলে অথবা যে কোনো বয়সে যে কোনো দুজনের এ ধরনের সমস্যা থাকলে আপনি কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন।

লক্ষণ: মলত্যাগের অভ্যাসের পরিবর্তন। ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা পর্যায়ক্রমে ডায়রিয়া ও কোষ্ঠকাঠিন্য। মলের সঙ্গে রক্ত মিশে থাকে। ওজন কমে যায়। দুর্বলতা। পেটে অস্বস্তিভাব যেমন- গ্যাস, পেট ফুলে থাকা, পেট ভর্তি ভাব, কামড়ানো প্রভৃতি। রক্তশূন্যতা।

রোগের শেষপর্যায়ে মলত্যাগ করতে না-পারা বা অন্ত্রনালি বন্ধ হয়ে যাওয়া।

মেহেরপুরে যক্ষা নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্র্যাকের সেমিনার

মেহেরপুরে যক্ষা নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিনব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করে জেলা ব্র্যাক অফিস। আজ বুধবার জেলা ব্র্যাকের রিজিওনাল অফিসের সম্মেলন কক্ষে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে ব্র্যাকের জেলা সমন্বয়কারী ফজলুল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী।

জেলা যক্ষা নিয়ন্ত্রণ অফিসের প্রোগ্রাম ওরগানাইজার লোকমান হোসেনের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- সিভিল সার্জন কার্যালয়ের চিকিৎসক হূমায়রা আয়শা, জেলা শিক্ষা অফিসের গবেষণা কর্মকর্তা মোঃ আক্তারুজ্জামান, ব্র্যাকের ম্যানেজার মোঃ আবু হানিফ মোরল প্রমুখ। সেমিনারে ইমাম ও শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন।

স্তন ক্যান্সারের উপসর্গ, কারা ঝুঁকিতে

নারীদের স্তন ক্যান্সার একটি জটিল সমস্যা। আবহাওয়া, খাদ্যাভ্যাস ও জীবন-যাত্রার পরিবর্তনের কারণে এই রোগের প্রকোপ বাড়ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বছর ১৫ হাজারের

বেশি মানুষ স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি ও উপসর্গ নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বক্ষব্যাধি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. রফিক আহমেদ।

নিম্নে উল্লেখিত নারীদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশি-

* যারা নিয়মিত স্ক্রিনিং করান না।

* বয়স ৪০ বছরের বেশি হলে কোনো উপসর্গ ছাড়াই চিকিৎসকের পরামর্শে ছয় থেকে বারো মাস অন্তর সব নারীকে ম্যামোগ্রাম করাতে হবে। রুটিন পরীক্ষা তো করাতেই হবে।

* ১২ বছরের আগে যদি ঋতুস্রাব শুরু হয়।

* কারও ঋতুস্রাব যদি ৫৫ বছরের পরও চলতে থাকে।

* পারিবারিক ইতিহাস অর্থাৎ মা, খালা, বোন, রক্তের সম্পর্ক যুক্ত। পরিবারের একজনের ক্যান্সার হলে অন্যদের মধ্যে ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়।

* প্রথম সন্তান যদি ৩৫ বছরের পর হয়। স্তনে অন্য কোনো রোগ হয়।

* যাদের সন্তান হয় না অর্থাৎ বন্ধ্যা।

* যাদের উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি।

উপসর্গ

অনেক নারী যাদের বয়স ১৫-৩৫ বছর, বুকের স্তনে বা দুই দিকেই মার্বেলের মতো গোল গোল এক বা একাধিক চাকা অর্থাৎ মাংস দলা থাকতে পারে- যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মসৃণ, রাবারের মতো, মার্জিন সহজে বোঝা যায়, নড়াচড়া করে ব্যথা থাকে না।

১৫-৪৫ বছর বয়সী মহিলাদের ১ থেকে ২ সেন্টিমিটার আকৃতির হতে পারে আবার অর্ধ সেন্টিমিটারও হতে পারে। কেন হয় কারণ জানা যায়নি। এটিকে বলা হয় বেনাইন অর্থাৎ শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়।

স্তন ক্যান্সারের সতর্ক সংকেত- যখন চিকিৎসকের কাছে অতি শিগগির যাবেন

* বুকের মধ্যে শক্ত চাকা, ঘন পুরো বা অমসৃণ, একই স্থানে থাকে।

* স্তন ফুলে গেলে গরম অনুভব হলে, লাল হয়ে গেলে অথবা ত্বক কালো হয়ে গেলে।

* স্তনের আকার, আকৃতি যদি দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে।

* স্তনের ত্বকে যদি গর্ত হয় বা কুঁচকে যায়।

* নিপল যদি বেশি চুলকায়, র্যাশ হয়, ঘা হয়।

* নিপল যদি হঠাৎ করে ফুলে যায় বা অংশ বিশেষ ফুলে যায়।

* হঠাৎ করেই নিপল দিয়ে রক্ত বা সাদা, যে কোনো তরল জাতীয় আঠালো পদার্থ নিঃসরণ হতে শুরু করে।

* হঠাৎ করেই স্তনের মধ্যে ব্যথা শুরু হয়েছে- তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

এমনটি হলে- তখন আর দেরি নয়, দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যাবেন।

কী করবেন

* ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

* কায়িক ও শারীরিক পরিশ্রম করুন। প্রতি দিন ঘাম ঝড়িয়ে ৩০-৪৫ মিনিট ব্যায়াম করুন।

* প্রতিদিন ৪ ধরনের ফল ও সবজি খেতে হবে।

* ধূমপান, মদ্যপান থেকে বিরত থাকুন।

* জন্ম বিরতিকরণ পিল সেবন থেকে বিরত থাকুন। বিশেষ করে যাদের বয়স ৩৫ বছর পার হয়েছে।

* ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর অনেকেই হরমোন থেরাপি গ্রহণ করেন- সেটি থেকে বিরত থাকুন।

* দুগ্ধবতী মায়েরা অবশ্যই বাচ্চাকে ৬ মাস পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ পান করাবেন। কমপক্ষে ২ বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়াবেন।

* ওষুধে রোগ সারায় আবার ওষুধেই স্তন ক্যান্সার হয়। যদি কেউ